মাতঙ্গিনী হাজরা

দুলালকৃষ্ণ দাস

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩.

।। লেখকের নিবেদন ।।

আত্মস্বার্থ মেনে চলাই আমাদের চিরন্তন জীবনচর্চার স্বাভাবিক ছন্দ। সাধারণ নাগরিক থেকে নগরপতি সবাই সেই ছন্দে চলতে চান। চলতে গিয়ে কখনো-কখনো নীতি নৈতিকতার কথাও ভুলে যান তারা। ফলে সুখ মেলে কিন্তু শান্তি আসে না। সেই সুখ সাধনায় অন্যের কথা আর ভাবা হয় না। দলনায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক কেউ যেন এর বাইরে নন। কখনো-কখনো শোনা যায় কেউ কেউ নাকি আত্মস্বার্থ চরিতার্থে জনস্বার্থ লুণ্ঠনেও প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু যদি এর উলটোটা হত! আমরা যদি শুধু নিজের কথা না ভেবে পরের কথাটাও ভাবতাম! তবে বোধহয় লাভের পরিমাণ কম হলেও কারও ক্ষতি হত না। তাতে সুখের আধিক্য কম হলেও শান্তিটা নিশ্চিত হত। এর একটি আদর্শ উদাহরণ ছিল মাতঙ্গিনী হাজরা। তিনি নিজের জন্য কিছুই ভাবেননি কখনও। পরের কল্যাণেই ছিল তার জীবনানন্দের মূল উৎস। তার গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। অকৃত্রিম দেশ সেবকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

আমরা গড়ের মাঠে তাঁর মূর্তি দেখেছি। শুনেছি তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অজেয় সৈনিক। সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়েও দেশের পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন। তাঁর অক্ষয় জীবনের আর খুব একটা কিছু জানা যায় হয়নি। কিন্তু ইতিহাস উপেক্ষিত সেই সব পূর্বসুরিদের 'ভালো'গুলি যদি আমরা জানতে না পারি, বা তা আবার উত্তরসুরিদের সামনে না তুলে ধরতে পারি, তাহলে ক্ষতি আমাদের সবারই। নবীনরা সঠিক দিশার অভাবে পথ হারিয়ে অবক্ষয়ের শিকার হবে। আমরা ক্রমোন্নতির পরিবর্তে অবনতিরই পথেরই পথিক হব।

তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। তার একটুকুও সফল হলে সার্থক, নইলে ক্ষমাপ্রার্থী। একাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সাবার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বিনীত লেখক

দুলালকৃষ্ণ দাস

সূচিপত্র

১.	উপক্রমণিকা	১৯
২.	তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার	২২
৩.	জন্মস্থান	২৬
৪.	জন্ম ও শৈশব	২৮
৫.	বৈবাহিক জীবন.	৩১
৬.	শ্বশুর বাড়ির বংশ তালিকা	৩৫
৭.	বৈধব্য জীবন	৩৮
	ধর্মচর্চা-রামকৃষ্ণ মিশন	৪১
	সমাজসেবা	৪৩
৮.	রাজনৈতিক জীবন	৪৬
	জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান	৪৯
	লবণ আইন অমান্য আন্দোলন	৫২
	ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন	৫৫
	সামাজিক আন্দোলন	৫৬
	গান্ধিবুড়ি	৫৬
	আদালতে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন	৫৮
	জন এন্ডারসনকে কালো পতাকা প্রদর্শন	৬১
	স্বরাজ কুটির	৬৪
	অতিথি পরায়ণ দেশপ্রেমিক	৬৭

৯.	২৯ সেপ্টেম্বরের গণ অভ্যুত্থান	৭০
	৮ সেপ্টেম্বর দনিপুরের ঘটনা	৭০
	২৯ সেপ্টেম্বরের প্রস্তুতি	৭২
	২২ সেপ্টেম্বর	৭৩
	মহিষাদল	৮১
	নন্দীগ্রাম	৮২
	সুতাহাটা	৮৪
	তমলুক	৮৪
	অন্তিমযাত্রা (২৯ সেপ্টেম্বর)	৯৩
	শেষকৃত্য	১০১
১০.	সালতামামি	১০৫
১১.	স্মারকস্মৃতি	১০৭
১২.	পরিশিষ্ট	১১০
১৩.	তথ্যপঞ্জি	১১৯

।। উপক্রমণিকা ।।

পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধানতার দাবি ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের পক্ষে সে দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ব্রিটিশ সরকার তা উপেক্ষা করেই চলেছিল। আবার পরাধীনতার গ্লানি ভারতবাসীর কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের অত্যাচারও চরম সীমায় পৌঁছেছিল। তাই গান্ধিজিকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ লড়াইয়ের ডাক দিতে হয়েছিল। ব্রিটিশদের তিনি এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষ ফরমান জারি করেন। তাই সেটা 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নামেই খ্যাত । তাকে 'আগস্ট বিপ্লব' ও বলা হয়।

ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে ৯ আগস্ট থেকে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে এবং জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে। মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদসহ কংগ্রেসের সব শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। সরকার ভেবেছিল মাথাগুলোকে আটকাতে পারলে আন্দোলনও থেমে যাবে। কিন্তু সরকারের সে আশা পূরণ হয়নি। বরং তার তীব্রতা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

গ্রেফতার হওয়ার পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গান্ধিজি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'এটাই আমাদের শেষ লড়াই। সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ আমরা পেলাম না। আমরা কারার অন্তরালে চলে যাচ্ছি। তা বলে জাতির মুক্তির সংগ্রাম বন্ধ থাকতে পারে না। আমাদের একান্ত কামনা সেই সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলুক। এখন থেকে প্রত্যেক ভারতবাসীই হবেন সংগ্রামের নেতা। তিনি তাঁর বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।' আর স্লোগান তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন,

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে-Do or die-করব অথবা মরব।' কবির ভাষায় 'মন্ত্রের সাধনা কিংবা শরীর পতন'। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করে শহিদ হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২৯ আগস্টের তাঁর সেই গৌরবময় মৃত্যু-মুহূর্তের ছবি মানুষের মনে আজও চিরভাস্বর হয়ে আছে।

তবে বীরঙ্গনার আত্মাহুতিতেই সে সংগ্রামের সমপ্তি ঘটেনি। তা গড়িয়েছিল ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। ১৫ আগস্ট আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম তা ছিল ব্রিটিশদের দেওয়া স্বাধীনতা। তারা যে ভাবে যেটুকু দিয়েছিল তাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তার আগেও আমরা একটা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। রীতিমতো সম্মুখ সমরে নেমে সশরীরে লড়াই করে তা অর্জন করতে হয়েছিল। তার জন্য অসংখ্য জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল। তাই মাতঙ্গিনী হাজরার সেদিনের আত্মাহুতি যেমন গৌরবের, সেই অর্জিত ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার কাহিনিও তেমনি গৌরবময় এবং রোমাঞ্চকর। তাই সেই ক্ষশস্থায়ী স্বাধীনতার রোমাঞ্চকর কাহিনির কিছুটা অন্তত বলতে না পারলে মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন কাহিনি সম্পূর্ণ হয় না। তাই আমরা মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন কাহিনি প্রথম থেকে শুরু না করে শেষ পর্ব দিয়েই শুরু করব।

গান্ধিজির আহ্বানে সারা দেশ জুড়ে এক অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতাকামী সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মেদিনীপুর জেলার নেতৃবৃন্দও গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। ক্ষেত্র আগে থেকেই অনেকটা প্রস্তুত ছিল। এবার শুধু চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া। সেই কাজের মূল দায়িত্বে ছিলেন সুশীলকুমার ধাড়া[১১]। তিনি সংগ্রামী সৈনিকদের এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন তারা যেন যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে কখনও পিছপা না হয়। কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যায়। তাই আমরা দেখেছিলাম ২৯ সেপ্টেম্বরের সেই গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের

কারোরই পিছন থেকে গুলি লাগেনি। আর প্রাণের ভয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়েও যাননি। গান্ধিজির ঘোষণার পর থেকে প্রায় দেড়মাস ধরে তমলুক মহকুমার সর্বত্র সেই প্রস্তুতির কাজ চলেছিল।

সেই অভূতপূর্ব আন্দোলনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গান্ধিজি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম গণতান্ত্রিক সংগ্রাম অতীতে কখনও ঘটেনি। যার লক্ষ্য ছিল অহিংস নীতি অবলম্বন করে সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে এক স্বাধীন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।' গান্ধিজির প্রত্যাশাপূরণে মেদিনীপুরবাসীও একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভারত-রাষ্ট্র করেছিল। আর সেই সরকারের নাম দেওয়া হয়েছিল 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র-তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' বা সংক্ষেপে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'। আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে সেই শিশু রাষ্ট্রের সঙ্গে একটু পরিচিতি হতে চেষ্টা করব।

॥ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ॥

(১৭/১২/৪২ থেকে ০১/০৯/৪৪)

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২১ মাস ব্যাপী এই সরকার শাসন কাজ চালিয়েছিল। এই সরকার ছিল অপারজেয়। ব্রিটিশ সরকারও তার দখল নিতে সক্ষম হয়নি। একমাত্র গান্ধিজির নির্দেশে সেই সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। ১ সেপ্টেম্বর তার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল।

তাম্রলিপ্ত সভ্যতার আদি পুরুষ ছিলেন চন্দ্রবংশোদ্ভূত ময়ূর বংশীয় রাজা ময়ূরধ্বজ। তিনি তাঁর পুত্র তাম্রধ্বজের রাজ্যাভিষেক করে রাজ্যের নাম রেখেছিলেন তাম্রলিপ্ত। আজকের 'তমলুক' শব্দটি 'তাম্রলিপ্ত' শব্দেরই অপভ্রংশ। তমলুকবাসীর রক্তে তাই রাজ-রক্তের উন্মাদনা চির শাশ্বত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এক সময় এই তাম্রলিপ্তই ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির ও সভ্যতার মিলনভূমি। আর আজকের তমলুক অঞ্চল ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী।

সেই সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত[১৩]। অর্থমন্ত্রী ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়[১] এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন সুশীলকুমার ধাড়া। তাকে বলা হত জি ও সি বা General Officer Commandant। এর মূল রূপকার ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলির প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনায় দায়িত্ব ছিল সুশীল ধাড়ার উপর। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি 'বিদ্যুৎ বাহিনী', 'গরমদল' এবং মেয়েদের জন্য পৃথক নারী বাহিনী 'ভগিনী সেনা' গঠন করেছিলেন। বাছা বাছা ৫০ জন নির্ভীক সেনা নিয়ে 'গরমদল' গঠিত হয়েছিল। তারা অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন। কখনও কোনো

অবস্থাতেই তারা গোপন তথ্য ফাঁস করতেন না। বিচার বিভাগের নির্দেশ কার্যকর করতেন। সেই দলে তিন জন মহিলাও ছিলেন।

সুতাহাটা, মহিষাদল, তমলুক ও নন্দীগ্রামসহ ৬টি থানার নয়শত গ্রামের প্রায় ২৯৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় এই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রায় ৯ লক্ষ লোক এই সরকারের শাসনাধীন ছিল। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি বিভাগ চালু করা হয়েছিল। যেমন স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, বিচার বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ, ডাক বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতি। স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য বিদ্যুৎ বাহিনী, ভগিনী বাহিনী এবং গরমদল গঠন করা হয়েছিল। এছাড়া প্রতিটি থানায় একজন করে সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

প্রচার বিভাগের থেকে 'বিপ্লবী' নামে একটি সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিন প্রকাশ করা হত। প্রতিটি সংখ্যায় প্রায় ৫০০ কপি ছাপা হত। দাম ধার্য কার হয়েছিল চার পয়সা। পত্রিকাটি ছাপা হত রাতের অন্ধকারে গোপন কুঠুরিতে। সম্পাদনা করতেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর গ্রেফতারের পর দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণ বাড়ী[৮]। কলকাতার পান পোস্তায় আসত গোপনে পানের মোট (বান্ডিল)-এর মধ্যে করে।

যে বান্ডিলের মধ্যে পত্রিকা থাকত সেগুলিতে সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া থাকত। সেই চিহ্ন দেখে দেখে গোপনে তার থেকে পত্রিকা বার করে নেওয়া হত। তারপর বিশ্বস্ত বাহকের মাধ্যমে তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। এই কাজের মূল দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র (কানু)[৯]। যাঁরা এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার [১০], বসুমতি পত্রিকার হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ[১১], যুগান্তর পত্রিকার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়[৬], শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত দাস[১২], প্রবাসী পত্রিকার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়[৪], এছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে নিতেন-